# আমার কাল আমার চিন্তা
# (ছাত্র জীবন)
## শাহ আবদুল হান্নান

**ছাত্র জীবন**

কখন থেকে আমি ক খ গ পড়া শুরু করলাম এবং তখনকার অনুভূতি কেমন ছিল তা আমার মনে নেই। তবে স্মৃতিকে ঘাটলে যতটুকু মনে পড়ে তা হলো একবারে ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল ছিল। সেখানে আমি ভর্তি হই। কিছুদিন ক্লাস করি। এর বেশি স্মৃতি আর মনে নেই। সেখানে কি পড়লাম, আর কি পড়লাম না মনে নেই। এই বিস্মৃতি সত্যিকার অর্থেই।

কর্মসূত্রে আমার আব্বার চাকরিস্থল ছিল তখন নেত্রকোনা জেলায়। সেখানে আমি ক্লাস টুতে পড়া শুরু করি। সেই স্কুলের নাম ছিল দত্ত হাই স্কুল। এটা নেত্রকোনা শহরে যে দু'টি বড় স্কুল ছিল তার মধ্যে একটি। সেই স্কুলে তখন আমার এক মামাও পড়তেন ক্লাস নাইনে, যিনি পরবর্তীতে এমপিও হয়েছিলেন। বছর কয়েক আগে তিনি মারা গেছেন। একই ক্লাসে মামার সাথে আমার দুই ফুফাতো ভাইও পড়তেন। এই দুই ভাইয়ের একজন জীবিত আছেন।

আমার স্কুল ঘর ছিল টিনের। আমি বাসা থেকে হেটে যেতাম। আমাদেরকে যেতে হতো থানার সামনে দিয়ে। প্রায় আধা মাইলের দূরত। একাই হেঁটে যেতাম, হেঁটে আসতাম। সে সময় সাধারণত বাচ্চাদের কেউ নিয়ে যেত না। সেই সময়কার খুব বেশি স্মৃতি আমার নেই। আবার তেমন কিছু মনেও নেই। তবে একটা স্মৃতির কথা আমি মনে করতে পারি যদিও তা আমার স্কুলের সাথে জড়িত নয়। ছোটবেলায় আমি কেমন ছাত্র ছিলাম, লেখাপড়া ভালো করে করতাম কি না সে সবের সেসব বিস্মৃত প্রায়। কিছুই মনে নেই। তবে এতটুকু মনে আছে যে আমি থানার সামনে দিয়ে স্কুলে যেতাম। থানাটা একটা বড় বিল্ডিং এ ছিল। খুব সম্ভব এটা শুধু থানাই ছিল না অন্য সরকারি অফিসও এর সাথে ছিল। তবে থানার স্মৃতিটাই আমার কাছে রয়ে গেছে। অন্য অফিসগুলোর কথাও স্মরণে নেই।

এটা '৪৭ এর আগের কথা। ভারতবর্ষ তখনো বৃটিশ কলোনি। পুলিশ হাফপ্যান্ট পরতো। মাথায় লম্বা পাগরির মতো পরতো। তাতে লম্বা লাল রঙের চিকন মতো একটা ফিতা ঝুলে থাকতো। কেন জানি আমার সেই থানার উপর দিয়ে যাবার সময় ভয় লাগতো। থানার পুলিশ দেখে ভয় লাগতো।

এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে আমার জীবনে ভয়টা কেমন করে যেন আমাকে পেয়ে বসে। আমার সব সময় ভয় লাগত এর একটি কারণ হতে পারে অল্প বয়সে আমরা নানা রকম গল্প শুনি। এসব গল্প ছোটবেলায় মনে গেঁথে যায়। একে স্মৃতিকর গল্প বলে। যা বাচ্চাদের মাসনিকতাকে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত করে। হয়তো তার মধ্যে ভয়ের গল্পও ছিল। কিন্তু এটাই স্মৃতিতে প্রাধান্য পেয়ে যায়।

এই জিনিসটাই আমি যখন পরবর্তীতে অনেক বইপত্র, সাহিত্য পড়ি তাতে পাই। 'গানস অব নাভারন' বলে আমি একটা বই পড়ি। সেখানে একটি চরিত্র ছিল এন্ড্রি স্টিভেনসের চরিত্র। এই এন্ড্রি স্টিভেনসের চরিত্রেও আমি দেখেছি তার ভিতর সব সময় একটা ভীতি কাজ করত। অনেক বড় বড় কাজ সে নিজে করতো এবং অন্যকে দিয়ে করালেও ভয়কে কিন্তু মন থেকে তাড়াতে পারত না। তার মনে সব সময় এই ভীতি ছিল যে সেই কাজ সে করতে পারবে না। ঠিক এরকমই একটা উপলব্ধি আমারও অনুভত হতো। জীবনভর এই জিনিসটাই আমাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে তা মোটামুটি বলা যায়।

যাই হোক, আমাকে সেই থানার সামনে দিয়েই স্কুলে যেতে হতো। স্কুল থেকে আসতে হতো। এবং পুলিশ দেখলেই সব সময় আমাকে একটা ভীতি তাড়া করে বেড়াত। আর এখনো আমার সেই পুলিশ ভীতি যায়নি। আমি বড় হয়েছি, বয়স হয়েছে, সরকারের সেক্রেটারি হয়েছি। জীবনে অনেক কাজই করেছি। কিন্তু তবু আমার মন থেকে পুলিশ ভীতি

যায়নি। অনেকের অনেক রকম ভীতি থাকে। কারোর মনে ডাক্তার ভীতি কাজ করে, কারো মনে শিক্ষক ভীতি বা অন্য কোনো ভীতি কাজ করে। আমার সেরকম কোনো ভীতি নেই। কিন্তু এই পুলিশ ভীতি আমার হচ্ছে কেন? এর একটা কারণ আমাদের দেশে পুলিশের যে ইমেজ রয়েছে এবং যেটা আমার সাইকে (phyche) প্রবেশ করেছে সেটা হলো পুলিশ সাধারণত জুলুম করে বা পুলিশ সুবিচার করে না।

আমার ছোটবেলার আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। আমি কিছুদিন স্কুলে যেতাম না। ক্লাস করতাম না। পালিয়ে বেড়াতাম। বেশ কিছু দিন এমন হলেও বাড়িতে কেউ জানতে পারেনি যে আমি ক্লাস করছি না। তবে এভাবে বেশি দিন আর চালাতে পারিনি। কয়েক দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যাই। কেমনে যেন আব্বা আমাকে ধরে ফেলেন। তিনি জানতে পারেন আমি ক্লাস করছি না। তিনি আমাকে খুব পিটান এবং ক্লাসে দিয়ে আসেন। এরপর থেকে আমার জীবনে এরকম ঘটনা আর ঘটেনি এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যতিক্রম হয়নি।

এটা হলো আমার ছাত্র অবস্থার একেবারে প্রাথমিক সময়ে কথা। এরপর আমার আব্বা বদলি হয়ে নারায়ণগঞ্জ যান। আমিও সেই হিসেবে নারায়ণগঞ্জ আসি। নারায়ণগঞ্জের পাশে একটা ছোট্ট শহর মীর কাদিম বলে নাম - সেখানে একটা স্কুলে ভর্তি হই। সেটা ছিল হিন্দু প্রধান এলাকা, মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের অংশ। সেই স্কুলে আমি চতুর্থ শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি। আমরা সেখানে এক হিন্দু জমিদারের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। সেই বাড়ির লোকজন তখন ইন্ডিয়া চলে যায়। তার পক্ষ থেকে কেউ এই বাড়ি আমার আব্বার কাছে ভাড়া দেন। সেটা একটা বিরাট দালান বাড়ি ছিল। এতবড় দালান সেই ছোট্ট শহরে মীর কাদিম বিকাবি বাজারে ছিল না। আমাদের বাড়ির আশে পাশে অনেক বানর ছিল। বড় বড় হনুমানও ছিল। আমি তখন হনুমানের ভয়েই ঘর থেকে বের হতাম না। বানরের ভয়েও না। আমাকে যে ভীতি পেয়ে বসত এটার তার আরেকটা উদাহরণ।

সেই স্কুলেরও তাৎপর্যপূর্ণ তেমন কিছু আমার স্মৃতিতে নেই। বলা যায় লেখাপড়া মোটামুটি করেছি। তার কিছুদিন পর আমি চলে আসি নারায়ণগঞ্জ শহরে। নারায়ণগঞ্জের দুইট বড় স্কুলের মধ্যে একটিতে আমি পড়াশুনা করি। হয়ত আরো অনেক ভালো স্কুল ছিল আমার জানা নেই। ছেলেদের একটা স্কুল হলো নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল আর একটা হলো বার একাডেমী। আমি বার একাডেমীতে ভর্তি হয়ে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়াশুনা করি। ওই সময়টাতে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাসাতে ছিলাম। এই স্কুলের সময়টাও আমার খুব ইভেন্টফুল ছিল তা আমি বলব না। সাধারণভাবেই আমি পড়াশুনা করে গেছি।

তবে সেখানকার দুই তিনটা ঘটনা খুব তাৎপর্যপূর্ণ যা এখনো আমার মনে পড়ে। আমি যদিও খুব ছোট ছাত্র ছিলাম কিন্তু সেই সময় আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের সাথে আমার একটা ঘটনা ঘটে। তা আমার পুরোপুরি মনে না পড়লেও ঘটনাটা দাগ কাটার মতোই ছিল। একজন সহকারী প্রধান শিক্ষকের সাথে সেভেন-এইটের একজন ছাত্রের কোনোরকম বিতর্কের কথা ভাবাই যায় না। তাও আবার সেই আমাদের আমলে। সেই সময় পাকিস্তান হয়ে গেছে। মুসলিম সেন্টিমেন্ট আছে। যার সাথে ঘটনা তিনি ছিলেন অমুসলিম, হিন্দু এবং সহকারী হেডমাস্টার। ভালো শিক্ষক ছিলেন, ভদ্রলোকও ছিলেন। তিনি একদিন বললেন কেবল হিন্দুদেরই বহু ঈশ্বরবাদ - এই ধারণাটা ঠিক নয়। আমরা যেমন বলি তাদের বহু ঈশ্বরের ধারণা আছে আর ইসলামে এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে। সেই শিক্ষক বললেন, মুসলমানদের মধ্যেও বহু ঈশ্বরের ধারণা আছে। ইসলামেও বহু ঈশ্বর আছে। রাহমান, রহীম, খালেক - তিনি এভাবে মুসলমানদের বহু ঈশ্বরের কথা বললেন। তিনি বললেন, হিন্দুদের ধর্মে যেমন বহু ঈশ্বরের ধারণা দেখা যায় তেমনি ইসলামের মধ্যে সেটা রয়েছে। এরকমই একটি কথা তিনি বলেছিলেন।

তখনো আমি ইসলামের কিছুই জানি না। ইসলামের প্রতি একটা আবেগ ছাড়া আর কিছুই আমার ভিতরে নেই, সেটা ইসলামের টানেই ছিল। কিন্তু আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি ক্লাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্যারকে বললাম, স্যার আপনি ঠিক বলেননি। আপনি যে সব নাম বললেন - রহমান, রহীম, খালেক এগুলো সব গুণবাচক নাম। এগুলো আল্লাহর বিভিন্ন গুণ। আল্লাহ একজনই। তখন সেই শিক্ষক আমার কথার উত্তরে বললেন, তুমি ঠিক বলনি। ইউ আর is. তিনি ভদ্রভাবেই আমাকে একথা বললেন। তাতে আমি চুপ করে গেলাম। তার উপর এসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, তার সাথে আমি কি তর্ক করব। কিন্তু পরের দিন তিনি আবার ক্লাসে এসেই বললেন- না, না, হান্নান ঠিকই বলেছে। আমিই ভুল। আমি ঠিক করে দেখেছি যে সেই সঠিক কথা বলেছে। এই কথাটা আমার মনে দাগ কাটে। আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ

মনে হয় যে, আমি তো খুব অল্প বয়সেই এরকম একটা বিষয় পয়েন্ট আউট (Point out) করতে পেরেছিলাম। তারচেয়েও বড় কথা হলো তিনি হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও পরদিন এসে আমার কথাকেই স্বীকার করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। এটা ছিল উনারও একটা মানসিক উদারতা এবং মহত্ত্বের লক্ষণ।

আরেকটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। জীবনের ঘটনাবহুল স্মৃতিগুলোই সাধারণত মনে থাকে। প্রত্যেকের জীবনেই তো কত ঘটনাই ঘটে। কিন্তু বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোই স্মৃতিতে থেকে যায়। এতো বড় জীবনের মধ্যে সেগুলোই স্থান পায়। আমাদের একজন নতুন হেড মাস্টার আসলেন। তিনি মুসলিম ছিলেন। তিনি আমাদের একটা ক্লাস নিতেন। তারই কোনো এক ক্লাসে একবার পর্দার কথা আসে। তিনি সে সময় একটা কথা বলেছিলেন যা আমার মনে গভীর দাগ কাটে। আমি এখনো অবাক হই, আমরা না জেনে কিভাবে এপলোজেটিক হয়ে যাই। বিষয়টা ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে। তিনি একবার বললেন, আমরা যে বলি ইউরোপের মেয়েরা পর্দা করে না তা সত্য নয়। তারা পর্দা করে। কিভাবে করে এর উত্তরে তিনি বললেন, তারা স্কার্ট পড়ে ঠিকই কিন্তু নিচে একটা লম্বা মোজা পড়ে। মাথায় একটা ছোট হেট পড়ে বা কাভার দেয়। আর হাতে ঝালরের মতো গ্লাভস জাতীয় কিছু পড়ে। যদিও শরীর দেখা যায়। তার এ কথা শুনে আমরা তখন খুশিই হলাম এই ভেবে যে ইসলাম রক্ষিত হচ্ছে এবং তারাও এরকম। ইউরোপের মেয়েরাও কোনো না কোনোভাবে পর্দা করে। হিজাব করে বা কভার দেয় কিংবা এরকম কিছু একটা করে। কিন্তু যখন আমার বয়স হলো তখন বুঝলাম কতবড় একটা বিভ্রান্তিমূলক কথা ছিল সেটি। তিনি তার সেই কথার মধ্যে এটি জাস্টিফাই করতে চাচ্ছিলেন যে এরকম করার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই এবং তিনি এর জন্য এরকম একটা খোঁড়া যুক্তি খাড়া করেছিলেন। এটা কোনোভাবেই সত্যিকার অর্থে শরীর ঢাকা বা কভার ছিল না। এই ঘটনা থেকে আরেকটি জিনিস প্রমাণ করে যে, আমরা সেই সময় কত ডিফেন্সিভে ছিলাম। ইসলামও সঠিক এবং তারা যা করছে তাও সঠিক - এরকম ধারণা অনেকের মধ্যে সেই সময় কমবেশি কাজ করতে। এই এটিচিউড বা এপোলজি তখন দেখেছি।

এরকম অকারণ ডিফেন্সের কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা আসলো কোত্থেকে? আসলে তখন তাদের যে লেখাপড়া তাতে এই এপোলজিটিকেল মাইন্ড (Apologitcal mind) তৈরি হয়। ঐ সময় ইসলামী সাহিত্য হয়ত এতটা সহজলভ্য ছিল না। কিংবা বিজ্ঞানের উত্থানের সাথে সাথে একটা ভীতি সৃষ্টি হচ্ছিল, বিজ্ঞান না আবার ধর্মকে উৎখাত করে দেয় এবং তার জন্য কোনো না কোনো ভাবে ইসলামকে জাস্টিফাই করা প্রয়োজন। কাজেই এগুলো ছিল এপোলোজেটিক মাইন্ডের কথা।

যাই হোক, আমাদের ক্লাসে ফার্স্ট বয় ছিল একজন হিন্দু ছেলে। সে ছিল চ্যাটার্জি। তার সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। সে খুব শক্ত এবং বিশ্বাসী হিন্দু ছিল। একাত্তরের আগে বা অল্প পরে সে ইন্ডিয়া চলে যায়। এরপর আবার ফিরে আসে। এর মধ্যে তাদের বাড়ি-ঘর, জমিজমা তারা হারায়। একাত্তরের ঘটনায় তাদের উপর প্রভাব পড়ে। আমি যখন এনবিআর (National Board of Revenue) এর ফার্স্ট সেক্রেটারি তখন নানা কারণে সে আমার কাছে আসত। আমি আমার সাধ্যমতো তাকে সাহায্য সহযোগিত করতাম। তার এক ছোট ভাই নাবিক হয়। কিন্তু সমুদ্রে এক দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। তার বাবা-মার মধ্যে অমিল ছিল। সে আরেকটি ফিৎনা। সে তার মাকে ভালোবাসত আবার বাপকেও ফেলতে পারতো না। এরকম অনেক সমস্যা নিয়ে সে আমার কাছে আসত। কথাবার্তা বলত এবং আই ইউসড টু হেলপ হিম হোয়টএভার আই কুড ডু। আমার কাছে অবাক লাগত আমি সিভিল সার্ভিস পাস করে এখানকার অফিসার আর আমারই ক্লাসের ফার্স্ট বয় সে কি না লেখাপড়া করতে পারেনি। আর্থিক দুর্দশা আর পরিস্থিতির কারণে হি বিকেম এ বেগার - এটা আমার মনে খুব ব্যাথা দিত।

নারায়ণগঞ্জের বার একাডেমীর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। হিন্দু মুসলিমের যে একটা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যাকে আমরা ডিভাইড (devide) বলি, তাতে যে মানসিক দূরত্ব সেটাও তখনকার সময়ে আমি লক্ষ্য করি। সেসব বিষয় আমি সবখানেই লক্ষ্য করেছি। আমার এটাও মনে পড়ে আমি যখন বিক্রমপুরের মীর কাদিমে ছিলাম সেখানকার পুরো এলাকাটা হিন্দু ছিল। আমি দেখেছি আমার যদি কলে পানি আনতে যেতাম বা কল পাড়ে দাঁড়াতাম তখন সেখানে জগ বা কলসি থাকলে তারা তার পানি ফেলে দিত। ভরা কলসি হলেও আবার নতুন করে তারা ভরে নিত। অর্থাৎ আমাদেরকে মোটামুটি অপবিত্রই মনে করা হত। মুসলিমদের স্পর্শে সব বুঝি অপবিত্র হয়। আমি নারায়ণগঞ্জ

থাকতেই হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে যে বিভক্তি তা লক্ষ্য করি, যদিও তা প্রকাশ্য রূপ নেয়নি কোথাও। তবে মুসলমানরা যেন শূদ্রদের অংশ বলে আমার কাছে মনে হতে।
এর মধ্যে আব্বা আবার বদলি হয়ে গেলেন। তখন আমি আব্বার এক বন্ধুর বাসায় কিছুদিন একা থাকলাম। তিনি আব্বার খুব প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তার নাম ছিল আবুল হোসেন। সেখানে থেকেই আমি ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষা দেই এবং পাস করে ক্লাস টেনে গিয়ে ভর্তি হই যশোর জেলা স্কুলে। সেই স্কুল থেকেই আমি আমার মেট্রিকুলেশন করি।

যশোর জেলা স্কুলের তিন চারজন ছাত্রের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। তবে ফার্স্ট বয় ছিলাম না। সেখানে আমি বাহির থেকে এসে ভর্তি হয়েছি। তাও টেনের মতো ক্লাস, একজনই শুধু বাহির থেকে ভর্তি হলাম। প্রথম দিনই আমাদের ইংরেজির স্যার আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আমাকে একটা বইয়ের নাম বলে সেটা আমি পড়েছি কিনা জানতে চাইলেন। আমি উত্তরে হ্যাঁ বলি। দি ভাইকার অব ওয়েলফিল্ড (The Vicar of Wakefield) বইটির নাম। আমি ভাইকার জাতীয় কিছু একটা শব্দ বলেছিলাম। তাতে সারা ক্লাস হো হো করে হেসে ওঠে। আমার সেটাই ছিল প্রথম ক্লাস। আসলে সেই শব্দের উচ্চারণ ছিল ভিকার, ভাইকার নয়। তাদের হাসার হয়তো কারণ ছিল কিন্তু আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি কি ভুল করলাম তা তো আমি বুঝতেই পারিনি। যে কোনো জায়গায় নতুন লোকের বেলায় যা হয় আমার বেলায়ও তাই হলো। এরকম নতুনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ওয়েলকাম না করে একটু মজা করি, খোঁচা দেই। এটা যদিও অস্বাভাবিক কিছু নয়, স্বাভাবিকই। সেই প্রথম ক্লাসে আমার এ ঘটনা ঘটেছিল।

আমি ইতিহাস, ভূগোল খুব ভালো জানতাম বলে অল্প দিনেই সেখানে আমি সবার খুব প্রিয় হতে পেরেছিলাম। ক্লাসে আরবি না নিয়ে উর্দু নিলাম। আব্বা আমাকে উর্দু নিতে বললেন। বোধহয়, এটাই ভাবলেন, উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে। সেই মনে করে হয়তো তিনি আমাকে উর্দু নিতে বললেন। এটা এক দিক দিয়ে আমার জন্যে ভালোই হলো যা পরবর্তীতে আমার জীবনে অনেক কাজে আসে। ইসলামের উপর আমার পড়াশুনাতেও বিশেষ কাজে লাগে। এতে সাব-কন্টিনেন্টের প্রধান দুটি ভাষা, বাংলা ও উর্দু আমার শেখা হয়ে যায়। আর হিন্দি তো শুধু স্ক্রিপ্ট বাদ দিলে উর্দুরই অন্য রূপ। সেটাও আমার জানা হয়ে যায়। পরবর্তীতে নিজের উদ্যোগে আরবি শিখে নেই।

স্কুল জীবনের আর দু'একটি ঘটনা যা আমার মনে পড়ে তার মধ্যে একটি হল তখন স্কুলে এসেম্বলি হতো। সেখানে এক টিচার ঘটনাক্রমে আমার আব্বার বন্ধু ছিলেন। একবার আমাকে তিনি টেনে নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতে বললেন। আমাকেই করতে হবে। আমি একদম নতুন ছাত্র। আমার সাহসও নেই যে পাঁচশ ছাত্রের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত করব। তবু আমি তা করলাম। সম্ভবত সূরা ফীল পড়েছিলাম। আমরা স্বাভাবিকভাবেই মোটামুটি দশটা সূরা মুখস্ত করে থাকি। সেদিন পড়ার পর নিয়মিত আমাকেই কুরআন তেলাওয়াত এবং তার অর্থ পড়তে হতো। এতে লাভ হয়েছিল - সমাবেশ এবং মঞ্চ ফেস করার যে ট্রেনিং সেটা আমার হয়ে যায়।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। স্কুলে একবার বেশ বড়সড় খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তখন সেখানে আমাকে একটি মূকাভিনয় করতে হয়েছিল 'রেডিও পাকিস্তান যশোর জেলা স্কুল'- এই নামে। সেখানে যে খেলাধূলা হবে তার রানিং কমেন্ট্রি আমাকে করতে হবে। আমি সেটা করেছিলাম এবং ভালোভাবেই করেছিল বলে মনে পড়ে। তারপর এক প্রদর্শনী হয়েছিল সেখানে অনেক কিছু দেখাতে হয়। আমার উপর তার একটা দায়িত্ব পড়েছিল। তাতে তিন চারজনের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সিবিশন ছিল। বিষয়টা এখন আর খেয়াল নেই। তবে তা প্রামান্য ধরণের ছিল। আমি মনে হয় সে দায়িত্বও সুন্দরভাবে পালন করি।

এসবের মধ্যেই সেখান থেকে ১৯৯৫ সালে আমি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেই। আমার স্কুল জীবন শেষ হয়।

**স্কুল পরবর্তী সময়**

তখন মেট্রিক বা এসএসসিকে মেট্রিকুলেশন বলা হতো। সেই বছর এপ্রিল-মে'র দিকে পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। স্কুল পর্যন্ত পড়াশুনা যশোর থেকে শেষ করে পরবর্তীতে জুন-জুলাই দিকে সেই একই বছরে ঢাকা কলেজে ভর্তি

হলাম। আমার মায়ের এক চাচাতো ভাই ছিলেন একেএম আমিনুল ইসলাম সাহেব। তিনি তৎকালীন সময়ে ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। পরবর্তীতে তিনি বিকিক (বাংলাদেশ কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন) এর চেয়ারম্যান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আমাকে সরাসরি প্রিন্সিপালের রুমে নিয়ে যান এবং সেখানেই আমার ভর্তি চূড়ান্ত করেন। আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে যাই।

আমি স্বাভাবিকভাবেই তখন শহরের কায়দা-কানুন ভালো জানতাম না। আর ঢাকা শহরেও এর আগে থাকিনি। দু'একবার বেড়াতে এসেছি মাত্র। মামার সঙ্গে যখন প্রিন্সিপালের রুমে যাই তখন প্রিন্সিপালের সামনেই আমি আমার প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তা দেখে প্রিন্সিপাল আমাকে বললেন, তুমি প্যান্টের পকেট থেকে হাত বের করে নাও। আমি সাথে সাথেই হাত বের করে নিলাম। পরে যখন রুম থেকে বের হলাম, রুম থেকে বের হতেই মামা আমাকে বকা দিলেন। বললেন, তুমি এটাও জানো না? কিন্তু সত্যিই আমি এটা জানতাম না যে, কোনটা সঠিক আচরণ আর কোনটা সঠিক নয়। কিন্তু সেই ঘটনাটা আমার এখনো মনে পড়ে কিভাবে ভর্তি হতে যেয়ে প্রথম দিনই এমন ঘটনা ঘটে গেল।

ঢাকা কলেজের তখন অবস্থান ছিল ফুলবাড়িয়াতে। অর্থাৎ পুরানো ঢাকার রেল স্টেশনের অপর পাড়ে। সেখানে পুরানো দু'তিনটি বিল্ডিং এর মধ্যে একটা ছিল কলেজের। তবে সেখানে মাত্র দু'তিনটা ক্লাস আমরা করতে পেরেছিলাম। এরপর আমাদের সময়েই বর্তমান স্থান ধানমন্ডিতে কলেজ স্থানান্তরিত হয়। সেখানে আমরা ১৯৫৫-১৯৫৭ পর্যন্ত পড়াশুনা করি। তখন ঢাকা কলেজের মাত্র নতুন বিল্ডিং হয়েছে। আমরাই তার প্রথম ছাত্র। ঢাকা কলেজের ডান পাশে নিউমার্কেট। কলেজ এবং নিউমার্কেটের মাঝখানে ছিল ধান ক্ষেত। সেই সময় কলেজ থেকে বেরিয়ে আমরা ধানক্ষেতের আইলের উপর দিয়ে হেঁটে নিউমার্কেটে গিয়ে চা খেতাম। কলেজের চারপাশের পরিবেশ ছিল খুব নীরব। লোকজন ছিল খুব কম। তখনও ধানমন্ডি পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। সেই অংশও অনেকটা ধানক্ষেত ছিল। সবে মাত্র ধানমন্ডি এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগছে। তবে যতটুকু মনে পড়ে, ঢাকা কলেজের সেটাই ছিল শেষ বিল্ডিং।

সেই দুই বছরের সময়টাও ছিল স্মৃতিময়। সব কথা বলে শেষ করা যাবে না। সব কথা প্রাসঙ্গিকও হবে না। কলেজে আমার রোল নম্বর ছিল একশ। তাই ছাত্ররা কেউ কেউ আমাকে ওয়ান হানড্রেড আর কেউ কেউ সেঞ্চুরি বলে ডাকত। আমি চঞ্চল টাইপের ছিলাম। সব কিছুতেও একটিভ ছিলাম। যার ফলে সবাই আমাকে কম বেশি চিনত। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র ঘোষিত হয়। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবের সরকার কেন্দ্রে। যুক্তফ্রন্ট, মুসলিম লীগ তাতে আছে। এরা মিলেই কেন্দ্রের সরকার। এ শাসনতন্ত্র সকল ইসলামী দল গ্রহণ করে, সমর্থন করে। সেই সাথে অন্যান্য সকল দলও এটা গ্রহণ করে, একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া। ১৯৫৪ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে তিনশ দশটি আসনের মধ্যে অমুসলিম আসনগুলো বাদে সবটাই যুক্তফ্রন্ট পায়। মুসলিম লীগ পায় মাত্র দশটি আসন। সে সময় আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় কম্পোনেন্ট পার্টি ছিল। সে দিক থেকে ৫৪তে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পর আওয়ামী লীগই ছিল মেজর পার্টি। সেই আওয়ামী সমর্থিত ছাত্ররাও তার ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিরোধীতা করে এবং কলেজে ধর্মঘটের আয়োজন করতে চেষ্টা করে। আমিও তাদের ভিতর একজন ছিলাম যারা একদম না বুঝে বিরোধীতা করের। যদিও শুধুমাত্র যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের সঙ্গে থাকা ছাড়া অন্য কিছু করার ছিল না। এর একটা কারণ ছিল, সে সময়ের বয়সটাই এমন যে তখন রাজনীতি কি তা যে কেউ ভালো বোঝে তাও নয়। কিন্তু তারপরেও মানুষ রাজনীতি করে। বিভিন্ন ইস্যুতে জড়িয়ে যায়। আমার পক্ষে একটা যুক্তি ছিল যে আমার বড় মামা নিজে একজন আওয়ামী লীগের খুব সক্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার মায়ের আপন ভাই একেএম শামসুল হক। আর প্রথমে যার কথা উল্লেখ করেছি তিনি ছিলেন একেএম আমিনুল ইসলাম, আমার মায়ের সবচেয়ে বড় চাচাতো ভাই। মায়ের একমাত্র চাচার বড় ছেলে।

আমার মামা খুব চরিত্রবান, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। তার একটা প্রভাব আমার উপর ছিল। সেই কারণে হলেও ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগের রাজনীতির একটা প্রভাব আমার উপর ক্রিয়াশীল ছিল। যার ফলেই আমি বিরোধিতা করেছিলাম। কিন্তু আমার মনে পড়ে একদল ছাত্র এর বিরোধীতা করেনি, করতে রাজি হয়নি। যদিও সে দিন কোনো ক্লাস হয়নি। একদল ছাত্র বেশ সাহসের সঙ্গে এ বিরোধীতাকে গ্রহণও করেনি। মীর্জা আজিজুল ইসলাম সাহেবের কথা মনে আছে। তিনি ম্যাট্রিকুলেশনে ফার্স্ট কি সেকেন্ড হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ফজলুল হক হলের ভিপি হয়েছিলেন।

সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। পরে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে যোগ দিয়ে সিভিল সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে দেন। তিনিও এর বিরোধীতা করেননি এবং করতে রাজিও হননি।

সে সময় কলেজে একটা কালচার চালু ছিল। তখন জাতীয় রাজনীতি তো ছিলই, তবু প্রায় জায়গাতেই রাজনীতিমুক্ত হয়ে লোকাল সংগঠন গড়ে উঠতো। এরকম সংগঠন ঢাকা কলেজেও ছিল। আমাদের সময় ডেমোক্রেটিক পার্টি ও পাইওনিয়ার পার্টি নামে দু'টি দল ছিল। এসব সংগঠন গুলো হতো কলেজ ভিত্তিক। সেখানে দেখা যেত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেও কলেজে ডেমোক্রেটিক হিসেবে সবাই এক। আবার অন্য দিকে পাইওনিয়ার হিসেবে তারাও এক। দেখা যাচ্ছে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশক্তি যে কোনো একটি পার্টিতে একত্রে আছে। যার ফলে সেখানে ছাত্র রাজনীতি আরেকটা রূপ গ্রহণ করত।

আমি একভাবে তখন ডেমোক্রেটিক পার্টিতে জড়িয়ে পড়ি। সেখানে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ডেমোক্রেট হিসেবে ছিলেন বর্তমান বিএনপির এমপি আমার ক্লাসমেট মুসফেকুর রহমান। বর্তমান বিএনপির শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন তখন ছিলেন ডেমোক্রেটিকের অন্যতম প্রধান নেতা। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাহেবও ডেমোক্রেটিকের নেতা ছিলেন। আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে তিনি তখন সেকেন্ড ইয়ারে অথবা থার্ড ইয়ারে বিএ পড়তেন। আমাদের ব্যাচের সময়ে আমি এবং মুসফেকুর রহমান ডেমোক্রেট নেতা (আহ্বায়ক) হলাম। সে অর্থে আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও হয়ে গেলাম। দুইটি দলের একটিতে জয়েন্ট কনেভেনর ছিলাম আমি এবং আমার সেই বন্ধু। মুসফিকুর রহমান পরবর্তীতে সেক্রেটারি হয়েছিলেন। আবার বর্তমান হাওয়া ভবনে বিগত অক্টোবর ২০০১ এর নির্বাচন পরিচালনার জন্য যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের একজন। এরাই সেই সময় নেতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। সেই সময় ছাত্রলীগ, ছাত্রশক্তির ছেলেরা কলেজ রাজনীতিতে একই দলের সদস্য হয়ে কাজ করতেন।

কলেজে থাকাবস্থায় সেই সময় আমি প্রথমবারের মতো ডেমোক্রেটিকের পক্ষ থেকে সাংবাদিকতায় জড়িয়ে পড়ি। সাংবাদিকতাও ঠিক বলা যায় না। আমরা একটা বুলেটিন বের করতাম। আমি তার অন্যতম সম্পাদক ছিলাম। একটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে আমরা একটা ভুল করে ফেলি। মানুষের স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে তখনও আমি বুঝতে পারিনি। আমারও সে সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা ছিল না। অধিকাংশ লোকেরই শুরুতে তা থাকে না। আবার অনেকের সারা জীবনেও হয় না। আমরা সেই সম্পাদকীয়তে একটা কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলাম 'নোয়াখালীর সব লোক যেমন খারাপ না...'। এ কথাটাকে টেনেই বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলাম, পয়েন্ট আউট করতে চেয়েছিলাম। এর মূল কথা ছিল কোনো স্থানের বা দলের সবাই খারাপ হয় না এবং কোনো এলাকাকে নির্দিষ্ট করে দায়ী করা ঠিক নয়। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে বিষয়টি নিয়ে অপনেন্ট পাইনিওয়াররা তখন আমাদের ধরে বসল। আমরা বিপদেই পড়ে গেলাম। তারা আমাদের পেপার ছিড়ে ফেলল। আমাদের উপর হামলা করার চেষ্টা করা হলো। আমি আগে থেকেই খুব দুর্বল স্টাকচারের ছিলাম। আমার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে সেই সময় প্রটেক্ট করার চেষ্টা করে। সেই উত্তেজনা আট দশ দিন পর্যন্ত ছিল। যদিও ঘটনাটা দুর্ভাগ্যের এবং তা আমার জন্য শিক্ষণীয় ছিল। আমি বুঝালাম মানুষের স্পর্শকাতরতাকে বুঝতে হয়। সব সত্য কথাই বলা যায় না। সব সত্য কাজই সবখানে করা যায় না। সব কিছুরই একটা সময় আছে, সুযোগ ও পরিস্থিতি আছে, তা বুঝেই কাজ করতে হয়।

আমাদের সময় শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন। আমাদের অংক পড়াতেন মঞ্জুরুল হক স্যার। তিনি ছিলেন এই দেশের প্রথম দিকের ইন্টারমিডিয়েট লেবেলের অংক বইয়ের একজন লেখক। ইংরেজিতেই বই লেখা হতো। পরবর্তীতে তিনি আমাদের প্রিন্সিপালও হয়েছিলেন। খুবই লম্বা মানুষ ছিলেন। সুন্দর ছিলেন। খুবই ভদ্র ছিলেন। খুব সহনশীল ছিলেন। তিনি ভালো মানুষগুলো অন্যতম একজন ছিলেন। তার এক ছেলে পরবর্তীতে বড় সার্জন হন এবং আমাদের ফ্যামিলির বন্ধু হয়ে যান। ইবনে সিনা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হলে আমি তাকে সেখানে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেই। তখন থেকে তিনি ইবনে সিনার মেডিকেল প্রোগ্রামগুলোতে জড়িত হয়ে যান। পরবর্তী এই ডাক্তার জিয়াউল হক আমাদের পারিবারিকভাবে ঘনিষ্ট হন। আমাদের অপারেশনও করেন।

মনসুর উদ্দিন সাহেব ছিলেন আমাদের শিক্ষক। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন দিকপাল। তিনি নিজের ক্ষেত্র অর্থাৎ সাহিত্যের বিরাট ব্যক্তি ছিলেন। তবে ক্লাস পরিচালনায় ছেলেদের মন যোগাতে পারেননি। ক্লাসে তিনি হাসি ঠাট্টা করতেন। ছাত্রদের বাদড় বলে কিংবা অন্য ধরনের বিশেষণ দিতেন। মনে আঘাত পাওয়ার মতো টাইটেল দিতেন। যে

পড়ানোর দুর্বলতার জন্যে তিনি ছেলেদের আকৃষ্ট করতে পারেননি। ফলে এই শিক্ষককে আমরা ছাত্ররা খুব ভালো করে বুঝতে পারতাম না। তখন তাকে পাগল টিচার হিসেবেই ভাবতাম। কিন্তু পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম যে এটা ছিল তার একটি ব্যক্তিগত আচরণ। আমরা যখন ধীরে ধীরে আরো বড় হচ্ছি, প্রত্যেকেই যার যার লেবেলে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি তখন তার সম্পর্কে বুঝতে পারলাম। তিনি বাংলা সাহিত্যে বিরাট অবদান রেখেছেন। তার অর্জন ব্যাপক। তিনি গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকগীতি হারামনি ৩ খণ্ডে সংগ্রহ করেছেন। এই ক্ষেত্রে তার জ্ঞান, চর্চা, অর্জন অত্যন্ত বড়। এই শিক্ষকের সাথে আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস পরবর্তীতে আরো নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে।

আমরা একই পাড়ায় থাকতাম। মনসুর উদ্দিন সাহেব আমাকে তার মেয়েদের পড়াতে বললেন। কিন্তু নানা কারণে আমি পড়াতে পারিনি। মাত্র পাঁচ সাত দিন পড়িয়েছিলাম। তার এক মেয়ে প্রফেসর হয়েছে। এক মেয়ের সাথে আমাদের কাস্টমসের এক অফিসারের বিয়ে হয়। তখন থেকে আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হই। সবচেয়ে বড় কথা মনসুর উদ্দিন সাহেবের বাসা আমার বাসা থেকে আধা মাইল দূরে ছিল। আমি থাকতাম বিজয়নগরের কোনায় অর্থাৎ কাকরাইল থেকে বিজয়নগর যেতে ডান দিকে আর তিনি থাকতেন শান্তিনগরে। কাজেই জীবনের শেষের দিনগুলোতে তিনি আমার বাসায় প্রায়ই আসতেন। তিনি আমার খুব কাছের হয়ে যান। আমার ছেলেমেয়েকে আদর করতেন। তার জীবনের শেষের দিকে ইসলাম নিয়ে আমার সঙ্গে তার মতবিরোধ হতো। আমি তার পিছনে সিরিয়াসলি চেষ্টা করি তাকে ইসলামের দিকে আনতে। তিনি নাস্তিকও ছিলেন না, ইসলাম বিরোধীও ছিলেন না। কিন্তু জীবনকে তিনি হালকাভাবে নিতেন। অথবা বলা যায়, আমরা যারা ইসলামের সিরিয়াস কর্মী, সবকিছু বাদ দিয়ে যারা ইসলামের জন্য কমিটেড হই, তিনি ঠিক সেরকম হননি বা এটার ঠিক প্রয়োজন আছে বলে বুঝতেও পারেননি। এর গুরুত্বও তিনি বুঝতে পারেননি। এর একটা কারণ হতে পারে হয়ত তাদের ছাত্রজীবনে এর তেমন একটা গুরুত্ব উপলব্ধি ছিল না। তবে তার সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তার মনে ইসলামের প্রতি কোনো প্রকার অনীহা ছিল বলে আমার কখনো মনে হয়নি। তার মৃত্যুও পরে তার সম্বন্ধে ছোট্ট একটি লেখাও আমি লিখেছি। উনার সাথে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ তাতে আছে। যাহোক এই শিক্ষকের সাথে আমি বিভিন্নভাবে পরবর্তীতে জড়িয়ে পড়ি এবং আমরা ঘনিষ্ট হই।

**ঢাকা মেডিকেলের পরিবর্তে জগন্নাথ কলেজ**

এরকমভাবে ঢাকা কলেজে আমাদের সময় যারা শিক্ষিত ছিলেন তারা সবাই অনেক বড় মাপের ছিলেন। আমি আইএসসি পাস করলাম। নানা কারণে রেজাল্ট ভালো হলো না। তখন সবাই আমাকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে বলল। আমি ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হবার জন্য ফরম জমা দেই। ভর্তিও হয়ে যেতাম। কিন্তু হঠাৎ করে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি আইএসসি পরীক্ষার পর বাংলাদেশের ইসলামী মুভমেন্টের সবচেয়ে বড় দল জামায়াতে ইসলামীর সংস্পর্শে আসি। ২০৫ নং নবাবপুর রোডে তাদের অফিস ছিল। একবার আমি সেখানে যাই। তারা আমাকে একটি দুইটি করে মাওলানা মওদূদীর বই দেয়। সেই বইগুলো আমি পড়ি। আমাকে প্রথম যে বইটি দেয়া হয় তা ছিল মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি'। বইটি ছোট। মাত্র পঞ্চাশ পৃষ্ঠার হলেও এই একটি বই পড়ার পরই আমার মনে পরিবর্তন আসে। আমি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যাই। আমার মনে নতুন করে রেভ্যুলেশন আসে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি জীবনে একেবারে অল্প বয়স থেকে ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন ছিলাম এবং এ ব্যাপারে আমাকে যে খুব বেশি একটা কেউ প্রভাবিত করেছিল তাও না। স্বভাবসুলভ ভাবেই আমি গ্রামের মসজিদে আজান দিতাম। মসজিদে ইমামতি করতাম। নামাযে আমি নিয়মিত ছিলাম। অল্প বয়স থেকেই রোজা শুরু করি এবং জীবনে তা কখনো ভঙ্গ করিনি। ক্লাস ফোর ফাইভ থেকে কারো কোনো প্রভাব ছাড়া নামাজে একদম নিয়মিত হয়ে যাই। এমনকি বাপ-মার কোনো উদ্যোগ ছাড়াই। সেটা পরবর্তীতে সব সময় অব্যাহত ছিল।

আমি এখন বুঝি, মাওলানা মওদূদীর 'ইসলামের দাওয়াত ও কর্মনীতি' বইটি পড়ার আগে আমি যে ইসলাম করতাম বা বুঝতাম সেটা ছিল একদম একটা অতি সাধারণ মানের ইসলাম সম্পর্কে বোঝা। এর বাইরে আর কোনো বোঝাপড়া আমার ছিল না। এটা সাধারণ জনগণের ব্যাপারেও একই রকম। নামাজ রোযা এসবই ইসলাম। এর বাইরে যে ইসলামের একটা ব্যাপকতা আছে তা জানতাম না। এই বিশ্ব সভ্যতায় এটা যে একটা বড় অংশীদার, জীবনের বিধান, এটা যে সারা জীবনকে গাইড করতে চায়, তাকে সংযত করতে চায়, নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, একটা সৎ দিকে (honest direction) প্রভাবিত করতে চায় এবং তার যে একটা কালচার রয়েছে অথবা তার এমন সব নীতিমালা রয়েছে যা কালচারকে প্রভাবিত করে - এসব জিনিস আমি তার আগ পর্যন্ত একেবারেই বুঝতে পারিনি। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর

এই বইটি প্রথম পড়েই বুঝে যাই, তিনি খুব শক্তিশালী একজন লেখক ও চিন্তাবিদ। এই লেখক খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। আর সেই সাথে আমি এটাও বুঝতে পারি যে ইসলামের দাওয়াত একটা মহৎ দাওয়াত। তিনি যে কর্মপদ্ধতি দিয়েছেন সেটা একটা ফলপ্রসু কর্মপদ্ধতি। এতে আমি কনভিন্সড হয়ে যাই। এটা এও প্রমাণ করে যে তিনি, মাওলানা মওদূদী কত শক্তিশালী লেখক ছিলেন। একজন মানুষ তার একটি মাত্র বই পড়ে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে - এটা তার চিন্তার গভীরতাও প্রমাণ করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। সে সময়ই মাওলানা মওদূদীর বেশ কয়েকটি বইয়ের অনুবাদ হয়। ইসলাম ও জাহেলিয়াত, ইসলামী আন্দোলনের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচি, ইসলামী বিপ্লবের পথ, শান্তির পথ, ভাঙাগড়া'র মতো বই যেগুলোতে তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেগুলো অনুবাদ হয়ে যায়। কথাগুলো প্রাসঙ্গিকতার জন্যেই এসে গেছে। যাই হোক, আমি সেই থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংস্পর্শে আসি। তারা আমাকে এর প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘে কাজ করতে বলে। তাদের সাথে যোগাযোগ হলো এবং আমি কিছু কিছু কাজ করতে শুরু করলাম।

আমার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার সময় হয়ে আসল। তখন ছাত্র সংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন ব্যারিস্টার কোরবানা আলী সাহেব। তিনি তখন আরবি শেষ বর্ষের ছাত্র। পরবর্তীতের তিনি ব্যারিস্টার হন এবং এর আগেই এম এ পাস করেন। তিনি তখন থেকেই বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সাথে সক্রিয় ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীতে ছিলেন। যুক্তরাজ্যে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ইসলামিক মিশন স্থাপন করেন। লন্ডনে থেকে তিনি ইসলামের জন্য বড় ধরণের ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন ইসলামী মুভমেন্টের ভিতর প্রথম ব্যরিস্টার। তিনিই আমাকে একেবারে টেনে ধরে, জোর করে জগন্নাথ কলেছে ভর্তি করে দিলেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে জগন্নাথে ভর্তি হতে হবে বলে তিনি আমাকে বিএ-তে ভর্তি করিয়েছিলেন। মেডিকেলে আর ভর্তি হওয়া হলো না।

'দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি রেডিকাল টার্ন ইন মাই লাইফ'। আমার হবার কথা একজন ডাক্তার। আজকে আমি হয়ত বা একজন প্রখ্যাত কিংবা অখ্যাত ডাক্তার হতাম। কিন্তু তার পরিবর্তে আমার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়। 'মাই লাইফ চেঞ্জড টোটালি অন দ্যাট ডে এন্ড আই গট এডমিটেড ইনটু জগন্নাথ কলেজ।'

আমি জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। আমার পরিবার তাতে খুব একটা সন্তুষ্ট হয়নি। বিশেষ করে আব্বা এটাকে ভালো চোখে দেখেননি। এটা স্বাভাবিক ছিল। সঠিক ও সঙ্গত চিন্তাই তাদের ছিল যে মেডিকেল কলেজ বাদ দিয়ে সাধারণ ডিগ্রীর জন্য কলেজে ভর্তি হওয়াকে মেনে নেবে না। যাই হোক তারা এ ব্যাপারে আমাকে খুব চাপ দেননি। তারা বলেননি যে, তুমি জগন্নাথ কলেজ ছেড়ে দাও, আবার মেডিকেল কলেজে ফিরে আসো। সেটাকে আমি তাদের মহত্ত্বই বলব।

জগন্নাথ কলেজ তখন বর্তমানের স্থানেই ছিল। এখন সেখানে অনেক নতুন দালানকোঠা হয়েছে। গত দশ পনেরো বছর আমি সেখানে যাইনি। ফলে কলেজের কি স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হয়েছে জানি না। শুনেছি আমদের সামনের ভবনের পিছনে বিরাট একটা কয়েকতলা নতুন ভবন হয়েছে। পাশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটা বিল্ডিং ছিল সেটাও নাকি তারা পেয়ে গেছে। বর্তমানে ছাত্রও বহুগুণে বেড়ে গেছে। সেখানে দিবা ও নৈশ ক্লাস হয়। আমাদের সময় রাত্রের ক্লাস ছিল না। তখন অনার্স ছিল না, এখন অনার্স হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হয়েছে। সবশেষে জগন্নাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছে। কাজেই জগন্নাথের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে।

জগন্নাথ কলেজ অনেক স্মৃতিময় ছিল। কোনো কোনো স্মৃতি বড় করে মনে পড়ে। একবার জগন্নাথ কলেজে একটা ডিবেট হয়। ডিবেটের বিষয় ছিল 'পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়'। আমি বিতর্কে অংশ নেই এবং আমি পর্দা প্রগতির অন্তরায় নয়-এর পক্ষে ছিলাম। সেই ডিবেটে জাজ হিসেবে আলাউদ্দিন আল আজাদ সহ অন্যান্যরা ছিলেন। ডিবেটে আমি প্রথম হই এবং টপ ডিবেটর হিসেবে গণ্য হই। সেখানে আমাদের যুক্তিগুলো অত্যন্ত শক্ত ও ভালো ছিল। আমার মনে আছে আমি খুবই ভালো বলেছিলাম এবং আমার শিক্ষকরা সেটার খুব প্রশংসা করেছিলেন।

আমার সময়ই প্রথম জগন্নাথ কলেজে ইসলামী ছাত্র সংঘের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার দায়িত্ব আমার উপরই আসে। সে সময় প্রায় বিশ ত্রিশজন ছাত্রকে আমি ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী বানাই। সে সময়ে আমার সঙ্গে যারা পড়তেন তাদের একজন ছিলেন সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী সাহেব। তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন।

পরবর্তীকালে তিনি ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্য হন এবং এর সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতাও ছিলেন। এছাড়াও যারা ছিলেন তারা বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন এবং ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষা দিলাম। সারা বছর নানা কাজেই ব্যস্ত থাকতাম। ফলে পড়াশুনাও তেমন করতে পারিনি। শুধু পরীক্ষার আগের শেষ তিন মাস প্রস্তুতি নেই। এমনিতে নানা সামাজিক কাজ ও ইসলামী আন্দোলন, এর মধ্যে আরো ছিল ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে মার্শাল ল'। আমাদের পরীক্ষা ১৯৫৯ সালের খুব সম্ভবত জুনের দিকে হয়। আটান্নর মার্শাল ল' হওয়ার কারণে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। সে সময়টাকে আমি আমার পড়াশুনার জন্যে পুরোপুরি কাজে লাগাই। নিজে নিজেই প্রস্তুতি নিয়েছি খুব ভালো করে, কোনো শিক্ষকের কাছে নয়। টেক্সট বুকগুলো খুব ভালো করে পড়েছি। পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে আমি টেক্সট বুককেই বেশি ব্যবহার করেছি একেবারে সরাসরি বইয়ের ভাষায়। ফলাফলের জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলাম। সে সময় ডিগ্রীতে বিশেষ করে বিএ পরীক্ষায় কখনো কোনো ফার্স্ট ক্লাস পেত না কেউ। এটা হতো আমাদের মার্কিং সিস্টেমের জন্য। সেটা এমন ছিল যে খুব ভালো লিখলেও কেউ ফার্স্ট ক্লাস পেত না। এরকম একটা অত্যন্ত বাজে ট্রাডিশন আমাদের দেশে ছিল। এর কোনো যুক্তি আমি খুঁজি পাই না। আমি মনে করলাম আমি সেকেন্ড ডিভিশনও পাবো না। ফলে যখন রেজাল্ট বের হলো রেজাল্ট শিটের থার্ড ডিভিশন আগে দেখা শুরু করলাম। আমি দেখলাম সেখানে আমার রেজাল্ট নেই। স্বভাবতই আমি খুবই আতঙ্কিত বোধ করলাম। কি হলো না হলো। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে আমি সেকেন্ড ডিভিশনে আমার রেজাল্ট পেয়ে গেলাম।

তখনও আমি বুঝিনি যে সারাদেশে আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। আমার মনে আছে সেদিনের ঘটনা। আমি সেদিন ফজলুল হক হলে গেলাম। সেখানে কয়েক বন্ধু থাকত তাদের কাছে। তারা তিন তলায় থাকতো। আমাকে দেখেই তারা হই চই করে উঠল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কেন তারা এত হইচই করেছে। তখন তাদের কাছেই প্রথম শুনলাম- রেডিওতে তারা শুনেছি আমি নাকি সারাদেশে সেকেন্ড হয়েছি। আমি একদম আকাশ থেকে পড়লাম এবং অনেকটা অবাক হয়ে গেলাম। আমি টেনস (tense) হলাম। আমার মনে টেনশন সৃষ্টি হলো। আমার স্বাভাবিক চলাফেরা বাধাগ্রস্ত হলো। আমি এটা ভাবিনি যে আমি সারাদেশের মধ্যে সেকেন্ড হয়ে যাব। অর্থাৎ পরিস্থিতিতে আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লাম। আমার মনে আছি আমি বাসায় ফিরলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল আমি হাঁটতে পারছিলাম না ভালো করে। আমি অন্য এক অনুভূতিতে আক্রান্ত ছিলাম। ফজলুল হক হল থেকে শান্তিনগরের আমাদের বাসা পর্যন্ত কিভাবে যে এসেছি! আনন্দেই বলি বা আবেগে কিংবা অনেকটা অবাক হয়ে বলি, এই অবস্থা আমার হয়েছিল।

পরদিন কলেজে গেলাম। কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করলাম। সব শিক্ষকরা মিলে আমাকে কনগ্রাচুলেট করল। বিএ পরীক্ষার প্রথম হয়েছিল কুমিল্লা থেকে। তারা বললেন, তুমি সেকেণ্ড হয়েছ। কিন্তু ফার্স্টের থেকে মাত্র কয়েকটা মার্কসের পার্থক্য ছিল। আমরা তোমাকে ফার্স্ট করার চেষ্টা করেছিলাম। এই কথাটা শোনায় আমি তা খুব ভালো বলে মনে করিনি। কারণ যে ফার্স্ট হবে তার স্থান কেন আমি নিতে যাব বা আমি কেন তাকে তার গেন্সরব থেকে বঞ্চিত করব।

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। জগন্নাথ কলেজের অনেক ঘটনাবহুল সময়কে পিছনে রেখে মাস্টার্স ১ম পর্বে, পলিটিক্যাল সায়েন্সে ভর্তি হলাম। ফজলুল হক হলে সিট নিলাম। রুম নাম্বার ডব্লিউ-৩। চার সিটের রুম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে তখন মেডিকেল কলেজের পূর্বদিকের অংশক এবং কার্জন হলকে বোঝাত। এখনকার লোকেরা সেটা বুঝতেই পারে না। বর্তমানে মেডিকেল কলেজের পূর্ব পাশের ছোট অংশটাই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পরবর্তীতে সেখানে একটা তিনতলা বিল্ডিং করা হয়। কার্জন হলে সায়েন্সের ক্লাসগুলো হতো। বর্তমান কলাভবনের মূল বিল্ডিং তখন ছিল না। তখন ছাত্র সংখ্যাও কম ছিল, চার পাঁচ হাজারের মতো সব মিলিয়ে। পরিবেশ ভালো ছিল। সব জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশাও ছিল না, যে সমস্ত মেলামেশা আজকাল আমরা দেখি। মেয়েরা আলাদাই চলত। বলা যায়, তখন এমন কিছু হতে দেখিনি যা আমাদের ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকতার বিরোধী

ছিল। তবে এ কথা ঠিক যে হিজাবের প্রচলন তেমন ছিল না। যে কোনো কারণেই হোক বাংলাদেশে, তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তানে কেন জানি হিজাব কমে গিয়েছিল। কেন এমন ঘটেছিল জানি না। পূর্ব পাকিস্তান তখনও রক্ষণশীল অঞ্চল ছিল। ঢাকার তখন পুরানো ঢাকাই ছিল প্রধান। সেখানেও রক্ষণশীল পরিবারই ছিল বেশি। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার এলিট মহলের একটা বড় অংশ সেকুলার হয়ে গিয়েছিল। সময়টা বায়ান্নর পর থেকে বলা যায়। ভাষা আন্দোলনকে কিছুটা আড়াল করে পরিকল্পিতভাবে তৎকালীন লেফট সেকুলার এলিমেন্ট যাদের ইসলাম সম্পর্কে কোনো ভালো ধারণা ছিল না তারাই এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল।

আমার সময়ই আমি এটা লক্ষ্য করি। তখন ছাত্র রাজনীতি ছিল। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, ছাত্র শক্তি প্রভৃতি দলের ছাত্র রাজনীতি ছিল। ইসলামী ছাত্র সংঘ ছিল নতুন। কিন্তু আস্তে আস্তে সংঘের প্রসার হতে থাকে। তৎকালীন সময় আমি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে যাই। সে সময় এখানে জাতীয়তাবাদের জোয়ার দেখা দেয়। কোনো সন্দেহ নাই যে, নানা কারণে তখন পূর্ব ও পশ্চিম অর্থাৎ পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে থাকে। নানা কারণে এট ঘটে। এর মধ্যে একটা ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। পলিটিক্যাল নেতারা জনমত, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেননি। মিলিটারিদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এটাকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব নানাবিধ কারণে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে থাকে এবং স্থানীয়ভাবে একটা শক্ত জাতীয়তাবাদের দেখা দেয় যাকে আমরা বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলি বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলি এবং তার ফলাফলও আমরা সবাই জানি। এটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

আমি এটাও লক্ষ্য করি যে, ইসলাম সম্পর্কে তখনই মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ব্যাপক ছিল। এখনও আছে। বর্তমানে অনেক বিষয় অনেক সুস্পষ্টতা এসেছে যা তখন এতটা ছিল না। যেমন, ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে সে সময় ব্যাপক ভুল বোঝাবুঝি ছিল। যেমন তখন ধারণা ছিল ইসলামের ভিত্তিতে কোনো অর্থনীতি গড়া সম্ভবই নয়। যে সুদ হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা ক্ষতিকর বিষয়, অত্যাচার ও নির্যাতনের একটা হাতিয়ার। সুদের কারণে অসংখ্য ব্যবসা ফেল করে। যে সুদকে আল্লাহতায়ালা নিষিদ্ধ করেছেন। সেই সুদকেই ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। যেটা ইসলামের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট হওয়া উচিত সেটাকে একটা মাইনাস পয়েন্ট করা হয়। বলা হয় ইসলাম যে সুদ হারাম করেছে, কিন্তু সুদ ছাড়া কি করে ব্যাংক করা সম্ভব আর ব্যাংক ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি তো সম্ভব নয়। ব্যাংক ছাড়া অর্থনীতি হবে না। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতি অসম্ভব। এরকম যুক্তিমালা দাঁড় করানো হতো যা আজকের দিনে ইসলামী ব্যাংকের আবির্ভাব ও অগ্রগতির প্রেক্ষিতে আর দাঁড় করানো সম্ভব নয়।

এছাড়াও নানা ধরণের ভুল বোঝাবুঝি তখন ছিল। ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্ভব নয় এই ধারণাও মানুষের মধ্যে ছিল। সেটা অবশ্য পাকিস্তানের ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পরপরই চলে যায়। তখন আরেকটি বিষয় খুবই লক্ষ্যণীয় ছিল। বাম রাজনীতির থেকে জামায়াত ইসলামী সম্পর্কে সে সময় প্রচণ্ড প্রোপাগান্ডা করা হতো। বলা হলো এরা আমেরিকার এজেন্ট। যদিও জামায়াতে ইসলামী প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার এজেন্ট কখনই ছিল না। কিন্তু এটা বলা হতো যেহেতু জামায়াত সোসালিস্টদের খুব বড় ধরণের বিরোধীতা করত। এর দুটি কারণও ছিল। একটি হলো সোসালিস্ট ডিক্টেটরশিপের কারণ। আরেকটি হলো সোসালিজমের ভিতরে নাস্তিকতার প্রাধান্য। এছাড়াও তাদের অভিমত হলো সকল সম্পত্তি রাস্ট্রের অধীণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা এবং ব্যক্তিকে দুর্বল করা, সমাজকে দুর্বল করা। এসব কারণে জামায়াত ইসলামী শক্তভাবে ইসলামের ভিত্তিতে বা ইসলামকে উল্লেখ করে সমাজতন্ত্রের বিরোধীতা করত। এদিকে সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করলেই তারা ধরে নিত সেটা ক্যাপিটালিজমের পক্ষে চলে গেছে। আর ক্যাপিটালিজমের পক্ষে চলা মানেই আমেরিকার পক্ষে যাওয়া। এই ছিল যুক্তি। কিন্তু প্রকতপক্ষে ইসলাম সোসালিজম বা ক্যাপিটালিজম কোনোটারই পক্ষে নয় তা বুঝতে বিভ্রান্তি হয়েছিল বা ইচ্ছা করেই এই বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছিল। এই দুইটি মতবাদেরই জন্ম পশ্চিমে। ইসলামের বিচারে সোসালিজমের অনেক বেশি দূরের। ক্যাপিটালিজমও দূরের। কিন্তু সোসালিজম আরো বেশি। তুলনামূলকভাবে ক্যাপিটেলিস্ট সোসাইটি বা ওয়েস্টার্ন আমেরিকান সোসাইটির গণতন্ত্র জিনিসটা ইসলামের কাছের। ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ও ইসলামের নিকটবর্তী। প্রপার্টি কিছু না কিছু ব্যক্তি রাখতে পারে এটাও ইসলামের কাছাকছি। এসব দিক থেকে বিচার করতে গেলে সোসালিজম ইসলাম থেকে অনেক দূরে। ক্যাপিটালিজম সেই তুলনায় দূরে কিন্তু অত দূরে নয়। এই বিষয়গুলি তারা বলেননি। তারা শুধু জনগণকে বিভ্রান্ত করত এভাবে যে সোসালিজমের এরা বিরোধিতা করছে নিশ্চয় এটা আমেরিকার দালাল। কিন্তু এটা খুব সাধারণ মতামত। এটা একটা জটিল বিষয়কে সাধারণ করে দেখা।

মূলত ইসলাম না ক্যাপিটালিজম না সোসালিজম। ইসলাম একটা স্বতন্ত্র বিষয়। এর একটা বিশ্বাস রয়েছে। স্ট্রাটেজি, কালচার, মেথড রয়েছে। এটা একটা জীবন পদ্ধতি (Way of life)| তার মধ্যে অবজেক্টিভ দৃষ্টিতে সোসালিজমের বা ক্যাপিটপলিজমের সাথে কিছু কিছু মিল আছে এবং অনেক অমিল আছে। স্ট্রাটেজিতেও কিছু মিল আছে কিছু অমিল আছে। এভাবেই বিষয়টিকে বিচার করতে হবে। কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এসব বিষয় তেমন বিচার করা হয়নি। আর আমাদের আচরণেও কিছু না কিছু ভুল থাকতে পারে। মনে হতে পারে কোথাও আমরা এমন কাজ করেছি যে আমাদের পলিসি প্রো-আমেরিকান। এটা তাদের মনে হয়ত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা সত্য ছিল বলে আমি মনে করি না।

তখন সামগ্রিক পরিবেশের মধ্যে দেশের মানুষ কনজারভেটিভই ছিল বলা যায়। চুয়ান্নতে যে আওয়ামী লীগকে মানুষ ভোট দেয় সে আওয়ামী লীগ তখন আওয়ামী-মুসলিম লীগ ছিল। যখন তারা মুসলিম লীগ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ করল তখনও তারা কিন্তু তাদেও গঠনতন্ত্রে বলল যে তারা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোনো কিছু করবে না। তারা ইসলামী শাসনতন্ত্রেও অধীনেই প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করল। এর আওতাতেই তারা দেড় বছর কেন্দ্রীয় সরকার চালালেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে দিয়ে। এমনকি ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের যে মেনিফেস্টো ছিল তাতেও একথা সুস্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে কুরআন এবং সুন্নাহ বিরোধী কিছু করা হবে না। আর বর্তমানে বাংলাদেশে তারা যে সর্বশেষ নির্বাচনে অংশ নিল ১ অক্টোবর ২০০১ এ তার জন্য যে মেনিফেস্টো তারা ইস্যু করেছিল তাতে তারা নতুন করে একথাই পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কিছু করব না। তবে এটা ঠিক যে আওয়ামী লীগের ভিতরে সেক্যুলারিজমের একটা প্রভাব ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ মুসলিম চেতনার বাইরে একথা আমি বলব না। তখন তো ছিলই না। তারা বাঙালী বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ দেখেনি। তারা সংঘর্ষ আছে বলেও মনে করিনি। আরবের অনেক লোক আছে যারা আরব জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের মধ্যে কোনো সংঘাত দেখে না। তাই এ বিষয়টি সম্পর্কে নানা মত হতে পারে। একবাক্যে এই কথাটা শেষ করে দেয়া যায় না। এটা জটিল একটা বিষয় যেখানে বিভিন্ন মত হতে পারে এবং তা তাৎপর্য পূর্ণ হতে পারে।

এসব দিক বিবেচনা করলে আমি বলব সামগ্রিক বিচারে আমাদের দেশের জনগণ ইসলামিক ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও বেশির ভাগ ছাত্রই ইসলামিক ছিল। খুব অল্প সংখ্যকই ইসলাম বিরোধী ছিল। তবে যারা ভোকাল (Vocal) বা যারা কথা বলে তাদের একটা বড় অংশ ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়ন। তখন এমনিতেই কমিউনিজম, সোস্যালিজমের জোয়ার। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা অনেকে নাস্তিক ছিল, অনেকে নাস্তিকের কাছাকাছি। তারা ধর্মীয় লোক ছিল তা বলা যাবে না। যদিও এসব লোকই পরবর্তীকালে, আমি নিজে দেখেছি, সংখ্যায় প্রায় নব্বই ভাগ সোসালিজম ছেড়ে দিয়েছে কিংবা সোসালিজমকে সঠিক বলে আর মনে করেনি। তাদের অনেকেই নামাজী হয়ে গেছে, তাদের অনেকেই হজ্ব করেছে। এমনকি তাদের অনেকেই বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের সাথে যোগ দিয়েছে। সেই সাথে সোসালিজমের পতনের পরে অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে।
আমার বিভিন্ন লেখায় এবং বক্তৃতায় আমি বলেছি - এখানে সেকুলারিজম মানে ঠিক রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম থেকে মুক্ত করে ফেলা নয়। কিতাবী সেকুলারিজম আর আওয়ামী লীগের সেকুলারিজম বা বিভিন্ন পার্টিও সেকুলারিজম এক করে দেখা ঠিক হবে না। সেকুলারিজম শব্দ ডিকশনারিতে যাই থাকুক বা টেকনিক্যালি যাই হোক এখানে বাস্তবে ‘কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন করা হবে না' এবং সেই সাথে সেকুলারিস্টরা 'আমি সেকুলার' এই কথার মধ্যে কোনো সংঘাত দেখা যায় না। অর্থাৎ তারা সেকুলারিজমকে মনে করে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। এখানে ধর্ম অসহিষ্ণু হবে না।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। এমএ-তে আমার একটি পেপার ছিল সোসালোজি বা সমাজ বিজ্ঞান। সোসালোজি আমাদের সময় থেকেই শুরু হয়। নতুন সাবজেক্ট হিসেবে আমাদের দু'এক ব্যাচ আগেও এই বিষয়টি পড়ানো শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সাবজেক্ট খোলা হয়। আমরা প্রথম কয়েক ব্যাচের মধ্যে ছিলাম। এটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের একটা পেপারও ছিল। সে হিসাবেই আমি এটা পড়ি।
সোসালজি পড়তে গিয়ে আমি বুঝতে পারলাম এর মাধ্যমে এখানে নাস্তিকতা ছড়ানোর একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। সোসালজিতে সমাজ স্টাডি করা হয় এবং সমাজের অংশ হিসেবে ধর্মকে পড়ানো হয়। এখানে ধর্মকে সরাসরি সোসালজিতে পড়ানো হয় (ধর্মীয় সাবজেক্ট বাদ দিলে)। অর্থাৎ ইসলামিক স্টাডিজ, আরবি, সংস্কৃত বা ফারসি বাদ দিলে কোনো আধুনিক সাবজেক্টের মধ্যে ধর্ম পড়ানো হয় সোসিওলজিতেই এবং এটাকে সমাজের একটা ফেনমেনন

মনে করা হয়। ধরে নেয়া হয় সমাজে যা কিছু ঘটছে তা মানুষই করছে। সমাজ স্টাডির অংশ হিসেবে ধর্মকে স্টাডি করা হয় এবং এটা ধরেই নেয়া হয় যে ধর্ম মানুষ তৈরি করেছে। সেই ভিত্তিতেই ধর্মকে পড়ানো হয়।

স্বাভাবিকভাবে যদি ধর্মকে ধরে নেয়া হয় যে সেটা মানুষ সৃষ্টি করেছে তাহলে বলাই যায় সে ধর্ম নাস্তিকতার জন্ম দেবেই। সেখানে ধর্মকে এভাবে পড়ানো হয় না যে ধর্ম সম্পর্কে ধর্মের বক্তব্য কি? সেখানে বিভিন্ন ধর্মের বক্তব্য আলাদা করেও পড়ানো হয় না। তবে সেখানে দু'টি মতামতের ভিত্তিতে পড়ানো যেতে পারে। প্রথমত ধর্মের বক্তব্য কি আর দ্বিতীয়ত যারা ধর্মকে মানেন না তাদের বক্তব্য কি? তাও পড়ানো হয় না। সোসালজিতে এটা সমাজের একটা ফেনমেনন মনে করা হয় এবং ধরেই নেয়া হয় সমাজে সকল ফেনমেননের জন্মদাতা হচ্ছে মানুষ।

ফলে সোসালোজি ডিপার্টমেন্টের টিচারদের মধ্যে কেউ কেউ নাস্তিক ছিলেন। সেখান থেকে নাস্তিকতা ছাড়াবারও চেষ্টা করা হতো। এতে ছেলেমেয়েরা মনে আঘাত পেতো। এরকম পরিস্থিতিতে আঘাতই পেয়ে থাকে। অথচ এটা খুব যুক্তিযুক্ত নয় যে ধর্মকে মানুষের সৃষ্টি বলে ধরে নিতে হবে। তারা ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পড়ায় না। তারা তুলনামূলক এ আলোচনা করে না যে, যারা বলে ধর্ম আল্লাহর সৃষ্টি তাদের বক্তব্য কি আর যারা বলেন মানুষের সৃষ্টি তাদের বক্তব্য কি? তাহলেও বোঝা যেত কিন্তু তা করা হতো না।

এতে আমিও অন্যান্য সকল ছাত্রের মতোই কষ্ট পেতাম। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করে যেতাম। হজম করে যেতাম। তবু এ নিয়ে শিক্ষকদের সাথে কিছু কিছু বিতর্কও হতো। যদিও তাদের সাথে খুব বেশি বিতর্ক করা সম্ভব হতো না, আবার সেটা আমরা করতামও না। এর প্রভাবে যে আমাদের সব ছেলেমেয়েরা নাস্তিক হয়ে গেছে তাও নয়। কারণ যাদের আলাদা করে ধর্ম বা ইসলাম সম্পর্কে জানাশুনা আছে তারা সোসালোজির এই প্রচারণা দ্বারা প্ররোচিত হতো না। আমার মনে পড়ে আমাদের এক টিচার ছিলেন, নূর মোহাম্মদ নামে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। খুব এগ্রেসিভ ছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে খুব কঠোর কথা বলতেন। কিন্তু আল্লাহর কি ইচ্ছা নূর মোহাম্মদ মিয়া সাহেব পরবর্তীতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যান এবং আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণে তিনি একটি কবিতার বই লেখেন। সেটা হয়েছিল বাংলাদেশ হবার পরে। আমার সাথেও পরে তার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনি বিভিন্ন সময় আমাকে টেলিফোন করেন, চিঠি দেন। আমাদের বিভিন্ন সময় দেখাও হয়েছিল। আমি তখন সিনিয়র অফিসার হয়েছি। আমিও তাকে যথাসাধ্য সম্মান, শ্রদ্ধা ও সাহায্য করেছি এবং করর চেষ্টা করেছি। আমি অবাক হয়েছি, নাস্তিকতার প্রচার যে সাবজেক্টের মাধ্যমে করা হতো সেই সাবজেক্টেরই একজন সিনিয়র টিচার কীভাবে এমন হয়ে গেলেন।

সোসালোজি ডিপার্টমেন্টের এ বিষয়টি আমাকে বিভিন্ন সময় নাড়া দেয়। আমার মনে হয় সোসালোজি ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে ইসলামিস্টদের অনেক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি, ড. আব্দুল হামিদ আবু সুলেমান তার The Crisis of the Muslim Mind বইতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা মুসলমানদের জন্য দুঃখজনক যে নানা ঐতিহাসিক কারণে সোসাল সায়েন্সের (social science) বিষয়গুলো মুসলমানদের হাতে পুরোপুরি ডেভেলপ করেনি। এটা আমাদের ব্যর্থতা। তারও বিভিন্ন কারণ তিনি তার সে বইতে ব্যাখ্যা করেছেন। যেসব বিষয়ের প্রতি নজর দেয়া দরকার তার মধ্যে প্রথমেই তিনি বলেছেন আচরণ বিজ্ঞানের (Behavioural Science) কথা যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। এসব সোসাল সায়েন্সে বিষয়গুলোতে আগে নজর দেবার কথা তিনি বলছেন। এর মধ্যে Pychology, Sociology, Political Science, Anthropology-i কথা তিনি বলছেন। তিনি বলেছেন, ইসলাম বলছে যে এ সকল বিহেভিয়ারে ভিত্তি হওয়া উচিত 'আল ফিতরা' - যেটা ইসলামে রয়েছে। ইসলাম যে জিনিসটা ভিত্তি করেছে। আল ফিতরা হলো মানুষের বেসিক স্বভাব। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, কুল্লু মওলুদিন আলাল ফিতরা - অর্থাৎ সকল জন্ম হয় বেসিক নেচারের (Nature) উপর। পিতামাতাই সন্তানদেরকে পরিবর্তন করে খৃস্টান বা ইহুদী বানায়। ড. সুলেমান আরো বলছেন, বেসিক নেচারই মূলত ইসলাম। অর্থাৎ বলা যায়, ইসলামই ফিতরা, ফিতরাই ইসলাম। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় মানুষের মৌলিক স্বভাবটাই ইসলাম।

তিনি বলছেন, সোসাল সায়েন্সগুলো বিশেষ করে বিহেভিয়েরাল সায়েন্সগুলোকে এই ফিতরাতের উপর স্থাপন করতে হবে। কারণ ফিতরাত বা মৌলিক বেশিষ্ট্য তার যে মানসিক গঠন সেটাই ফিতরাত, সেটাই আচরণ। কাজেই সকল বিহেভিয়েরাল সায়েন্সের ভিত্তি হতে হবে ফিতরায়। আমিও তার সাথে এক মত। তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি কথা

বলেছেন যে Sociology, Psychology, Anthropology প্রভৃতি বিষয়সমূহকে ভিত্তি করতে হবে আমাদের বানোয়াট চিন্তাধারার উপর নয় মূলত আমাদের বেসিক ফিতরাতের উপর। আমাদের বের করতে হবে যে মানুষের বেসিক ফিতরাতটি কি? মানুষের মৌলিক কাঠামোটি কি? সেটি বের করাই আমাদের কাজ এবং তার উপরই আমাদের এসব সোসাল সায়েন্সগুলোকে দাঁড় করাতে হবে।

মোজাফফর আহমদ চৌধুরী সাহেব পলিটিক্যাল সায়েন্সের একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। তিনি সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। পাওয়ারফুল টিচার ছিলেন। তিনি আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন। তিনি সেকুলার ছিলেন। তার পড়াশুনাও স্যেকুলার ধরনের ছিল। একবার ক্লাসে তার সঙ্গে আমার বিতর্ক হয়। একদিন তিনি ক্লাসে বললেন, ইসলামকে কি করে আমাদের সমাজ, রাষ্ট্রের সংবিধানের ভিত্তি করব যেখানে মুসলমানরা মুসলমানের সংজ্ঞা (Definition) নিয়ে একমত না। ১৯৫২ সালে পাঞ্জাবে যে দাঙ্গা হয়েছিল এর উপর মুনীর কমিশনের একটি রিপোর্ট তৈরি করে। তিনি সেই রিপোর্ট পড়েছিলেন। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন জাস্টিস মুনীর যিনি পাকিস্তানের চিপ জাস্টিস হয়েছিলেন। মুনীর সাহেবও সেক্যুলার ছিলেন। তিনি তার রিপোর্টে এমন এক কথা বলেছিলেন যে, ইসলামিক রাস্ট্র হওয়া খুবই কঠিন, অসম্ভব, যেখানে মুসলিম-এর ডেফিনেশনেই তারা একমত নয়। মুসলিম কাকে কলে এর কোনো ডেফিনেশন নেই। একথাটাকেই আমাদের ক্লাসে মোজাফফর আহমদ চৌধুরী সাহেব খুব বড় করে বললেন। এই বক্তব্যটা ঈমানদার ছেলেদের জন্য একটা ধাক্কা ছিল যে, তাহলে ইসলাম কি করে হবে যদি তারা মুসলমানের ডেফিনেশনে একমত হতে না পারে?

কিন্তু আমি বললাম, স্যার আপনি যেটা বলছেন সেটা সঠিক বলেননি। আমি শুধু মুনীর কমিশনের রিপোর্ট পড়িনি এর উপর যে এনালাইসিস হয়েছে সেটাও পড়েছি। একদল স্কলার An analysis of Munir Commission Report হেডিংয়ে এই রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছেন এবং তারা দেখিয়েছেন এটা আসল কোনো বিষয় নয়। যেমন, আপনি এখন ক্লাসে পড়াচ্ছেন, আপনি যদি সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে মানুষের সজ্ঞা কি? তাহলে দেখা যাবে আমাদের উত্তরে ভাষা এক হবে না। সংজ্ঞায়িত করতে গেলে মানুষকে আমরা বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করব। কিন্তু আর মানে এই নয় যে মানুষ নাই কিংবা মানুষ পঞ্চাশ রকম বা মানুষ কাকে বলে তা আমরা বুঝি না। এটা আপনার একটা সুযোগ গ্রহণ করা যে একশ জন আলেমকে আপনি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন মুসলমান কাকে বলে বলতে। তারা একশ ভাষায় বলল। আসলে তারা একই কথা বলেছে। কিন্তু এতে কেউ একটু বিস্তৃত করল, কেউ একটু সংক্ষিপ্ত বরল। কেউ ভিন্ন ভাষায় বলল। আর আপনি এই পার্থক্যকে দেখিয়ে বলছেন যে তারা মুসলমান কি - তা বোঝে না।

আসলে মানুষ নিয়েও একই কথা হবে। মুসলমানের চেয়েও মৌলিক হচ্ছে মানুষ। মানুষের সংজ্ঞা নিয়ে আপনি যদি কোনো গেদারিংয়ে সংজ্ঞায়িত করতে বলেন তাহলে সেখানেও বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম বলবে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তারা মানুষের মৌলিকত্ব বা মৌলিক সত্ত্বা সম্পর্কে কিংবা মানুষ কাকে বলে সে সম্পর্কে বোঝে না। সুতরাং মুনীর কমিশন রিপোর্টে বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা হয়েছে একটা একাডেমিক আনফেয়ারনেস বা অসততা। এখানে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের উপর জ্ঞানগত অবিচার করা হয়েছে। আমার এ কথা শোনার পরও তিনি আমার কথা মানলেন না। অবশ্যই তিনি অনেক সম্মানীয় ব্যক্তি, আমার টিচার। তিনি আমার যুক্তি না মানলেও ক্লাসের পরে ছাত্ররা আমাকে বলল, তুমিই জিতেছ। এই কথাটা এখনও আমার মনে পড়ে। সেটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয়ও। এর ভিতর তত্ত্বগত একটা বিষয় আছে।

আমাদের একজন স্বনামধন্য টিচার ছিলেন ড. নিউম্যান। তিনি হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন। তিনি ইহুদী ছিলেন। বড় মাপের টিচার ছিলেন। বড় ফিগার ছিলেন। তাকে বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল। তিনি আমাদের পলিটিক্যাল থট পড়াতেন। প্লেটো, এরিস্টটল, সক্রেটিস পড়াতেন। আমার মনে আছে তিনি আমাদের প্লেটোর বই রিপাবলিক পড়িয়েছেন। রিপাবলিক বইতে এডামেন্টাস সহ অনেক চরিত্রই আছে। তিনি ছাত্রদের বিভিন্ন চরিত্রে ভাগ করে করে পড়াতেন। ক্লাসের এক প্রান্ত থেকে শুরু করতেন। প্রথম জন এডামেন্টাস হলে অন্যান্য চরিত্রগুলো ছাত্রদেও পরপর পালন করতে হতো। এভাবেই তিনি পড়াতেন। তিনি ভীষণভাবে কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলেন। তখন এদেশে সোস্যালিস্টদের যে উত্থান হচ্ছিল তাকে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে থামাবার চেষ্টা করতেন। সেটা রাইট কি রং ছিল আমি সেদিকে যাচ্ছি না। বিদেশী হিসেবে এতে তার জড়িত হওয়া উচিত হয়েছে কি হয়নি সে প্রশ্নেও আমি যাচ্ছি না। কিন্তু তিনি সিরিয়াসলি মনে করতেন যে সোসালিজম যদি এই দেশে আসে তাহলে এখান থেকে গণতন্ত্র বিদায় হবে।

মানুষদের অধিকার নষ্ট হবে। মানুষের স্বাধীনতা থাকবে না। এতে একটি ইন্টেলেকচুয়াল পতন হবে। আধ্যাত্মিক পতন হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা নষ্ট হবে। এতে সকল ধরনের স্বাধীনতা নষ্ট হবে।

আমি তাকে বছর খানেক টিচার হিসাবে পেয়েছিলাম। তারপর তিনি চলে যান। এরপর ১৯৬১ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে আমাদের পরীক্ষা হলো। পরীক্ষা দিয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্সের সেই ব্যাচে আমি ফার্স্ট হলাম। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছুদিন ল' পড়েছিলাম। সেই সাথে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যও তৈরি হচ্ছিলাম। যদিও ল' পরীক্ষা দেয়া হয়নি কিন্তু কোর্স প্রায় কমপ্লিট করেছিলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আমার ছাত্রজীবনের স্মৃতিগুলোর যতটুকু মনে পড়ে তা ছিল এই রকমই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। আমি তখন ল' পড়ছি। ছাত্রনেতাও আছি। এ সময় কিছু ঘটনা ঘটে। তখন একদিকে কঙ্গোতে সামরিক ক্যু হয়। আর্মি ক্ষমতা দখল করে এবং পেট্রিস লুবুম্বা, যিনি কঙ্গোর বিপ্লবী নেতা ছিলেন, মার্কিসিস্ট ছিলেন, তাকে আর্মি হত্যা করে এবং জেনারেল মোবুতু ক্ষমতা দখল করেন। এটি বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টদের নাড়া দেয়। তারা স্বাভাবিকভাবেই কষ্ট পায়। যিনি কোনো অন্যায় করেননি, অত্যাচার করেননি, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, উপনিবেশিক শক্তিকে যেতে বাধ্য করেন আন্দোলন করে, সংগ্রাম করে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে - তাকে আর্মি হত্যা করল। এতে আমার কাছে যেটা মনে হয় তাহলো পশ্চিমা সরকারগুলো তাদের ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে এরকম ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটায়। তারা কখনো এগুলো প্রকাশ্যে বলবে না। কিন্তু সিআইএ'র বাজেট দেখলেই বোঝা যায় এ টাকাগুলো তারা কিভাবে ব্যয় করে, কিসে ব্যয় করে? প্রত্যেক দেশে তারা এজেন্ট তৈরি করে। তারা সিভিল সার্ভিসে, সংবাদপত্রে, আর্মির মধ্যে এজেন্ট তৈরি করে তাদের দিয়ে পারপাস সার্ভ করে। যদিও তারা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়। অন্যরা এরকম কিছু করলে নিন্দা করে কিন্তু নিজেরা সিআইএ'র মাধ্যমে সারা দুনিয়াতে এ কাজই করে বেড়ায়। রাশিয়া, বৃটেনও এরকম করেছে তবে সবচেয়ে সক্রিয় হলো আমেরিকা এজেন্টের মাধ্যমেই তারা এরকম অন্যায় কু-কর্ম করে থাকে। খুব ভালো কাজ যে করে সেটা মনে হয় না।

যাই হোক, পেট্রিস লুবুম্বাকে হত্যা করা হলো। এদিকে প্রায় কাছাকাছি সময় ইন্ডিয়াতে রায়ট হয়। যতদূর মনে পড়ে জামশেদপুর, বোরকোলোসহ বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিভন্ন এলাকায় রায়ট হয় এবং হাজার হাজার লোক মারা যায়। অনেকটা আজকের (২০০২ সালের) গুজরাটের ভয়াবহ নৃশংসতার মতো। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো পেট্রিস লুমুম্বার হত্যার বিরুদ্ধে মিটিং মিছিল করে। কিন্তু ইন্ডিয়ার রায়টের ব্যাপারে একদম চুপ। অথচ তখন সেখানে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে। ফলে ঐ সময় যারা ডানপন্থী বলে পরিচিত ছিল সিদ্ধান্ত নিল তারা একটা মিটিং করবে। আমি কখনোই এগ্রেসিভ ছিলাম না। সেই সময় দেশে মার্শাল ল' ছিল। মিটিং সহজে করা যেত না। ফলে নেতৃবৃন্দ সবাই মিলে ঠিক করলেন যে আমাকে দিয়ে বক্তৃতা শুরু করা হবে। এদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার হাসনাত সাহেব, তিনি এনএসএফ এর নেতা ছিলেন। কিছুদিন আগে মারা গেলেন ব্যারিস্টার এআর ইউসুফসহ অন্যান্য ডানপন্থী নেতারা আমাকে সভাপতি হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং প্রথম বক্তব্য দিতে বললেন। বিক্ষোভ শুরু হওয়ার আগেই ছাত্ররা বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে ঘুরতে তৎকালীন আমতলায় একত্র হয়ে গেল। যেহেতু আমি ভালো বক্তা ছিলাম এবং খুব সংক্ষেপে বক্তব্য রাখতে পারতাম আমাকে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করানোর সেটাও একটা কারণ হতে পারে। ইসলামী ছাত্রসংঘ তখন খুব একটা শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন ছিল না তা সত্ত্বেও আমি ছাত্রসংঘের একজন নেতা ছিলাম বলে এরকম করা হলো। আমি দাঁড়ালাম এবং মোটামুটি খুব জোড়ালো একটা বক্তৃতা দিলাম। বাস্তব কথাই বললাম। বাম ছাত্রটা প্রেট্রিস লুমুম্বাকে নিয়ে বলছে অথচ পাশের দেশের মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার কথা বলছে না। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে দুই ঘটনারই কথা বলা প্রতিবাদ করা। তা না করে তারা একটার ব্যাপারে বলছে আরেকটা ব্যাপারে বলছে না। এটা হচ্ছে তাদের ভারতের দালালী, ভারতের তোষণ নীতি। তারা ভারতের পক্ষে কাজ করছে। এতে তারা গোটা ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে না। এই ধরনের বক্তব্যই আমি দিয়েছিলাম। সে সময় হয়ত হতে পারে আমরা পেট্রিস লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডের নিন্দা হয়ত করিনি বা করতে পারিনি। হতে পারে আমাদের পলিটিক্যাল প্রাকটিস সঠিক না হওয়ার কারণে এরকম হয় আমাদের সমাজে। কিন্তু আমি অন্য সাইড তুলে ধরলাম।

এরই মধ্যে ঘটনা একটা ঘটে গেল। নিশ্চয়ই অন্য নেতারা তৈরিই ছিলেন যেটা আমাকে বলেননি। তারা ঐ সভা থেকে আমার দশ মিনিটের বক্তৃতার পরই ছোট্ট একটা মিছিল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে এক গজ দূরত্বে অবস্থিত ডাকসু অফিসে গিয়ে হামলা করল। অফিস তালা মারা ছিল। তালা ভেঙে ফেলল। ভিতরের জিনিসপত্র ভেঙে ফেলল। এরকম

একটা ঘটনা মুহূর্তে ঘটে গেল যেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কেননা এগুলো আমি কখনোই পছন্দই করিনি। নিজেও এর মধ্যে জড়াইনি। যারা আমার চেয়েও আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র নেতা ছিলেন, যারা অন্যান্য সংগঠনের সিনিয়র নেতা তারা এই কাণ্ডগুলো করলেন। তখন আমি থামাতেও চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কথা কে শোনো। আমি এমনিতেই শুকনা মানুষ। দুর্বল ও পাতলা মানুষ। আমি কিছুই করতে পারলাম না।

পরদিন পত্রিকায় কি কি আসল তা ঠিক মনে নেই। এ ঘটনায় তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট খুব সাবধান হয়ে গেল যাতে এখানে কোনো রায়ট না হতে পারে। এটা একটা ভালো উদ্যোগ ছিল। এখানকার তৎকালীন চীফ সেক্রেটারি আজফার সাহেব এ ঘটনার পর আমাদেরকে ডেকে পাঠান। জনাব এ আর ইউসুফ, জনাব হাসনাত এবং আমি সহ আমরা সাত আট জন যাই। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা আর এগুলো করে না। আমরা এখানে শান্তি চাই। এখানে অশান্তি করলে দেশের সম্মান নষ্ট হবে। ইন্ডিয়াতে আরো প্রতিক্রিয়া হবে। এগুলো করা ঠিক হবে না। তিনি জানালেন, ইতিমধ্যেই বগুড়া সহ কয়েকটা জায়গায় ছোটখাট ঘটনা ঘটে গেছে। সেগুলো সামলাতেই আমরা হিমশিম খাচ্ছি। তবে তোমাদের সেন্টিমেন্ট আমরা বুঝি। এই সেন্টিমেন্ট আমরা আমাদের গভমেন্টকে জানাবো। ইন্ডিয়ান গভমেন্টকেও জানাবো।

এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমি এর থেকে এটাও ফিল করি যে ছাত্র রাজনীতি কেমন একপেশে হয়ে যায় এটা তার একটা উদাহরণ। হঠাৎ করে কেউ ভায়োলেন্ট হয়ে যেতে পারে তারও উদাহরণ। আর আমাদের পড়াশুনা ভালো না থাকলে, সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকলে, অভিজ্ঞতা না হলে আমরা আনফেয়ার হয়ে যেতে পারি এটা তাই প্রমাণ করে।

*(অনুলিখন ও সম্পাদনায় : ওমর বিশ্বাস)*